সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | নভেম্বর ২০২৪ | মূল্য ৫ টাকা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৩ মাস

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, গণহত্যার বিচার, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত কর গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় ফ্যাসিবাদের বিলোপ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩ মাস অতিবাহিত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ব্যাপারে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু বিপুল আশার বিপরীতে অন্তর্বর্তী সরকারের গত ৩ মাসের কার্যাবলী জনগণের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এবং সংশয়ও তৈরি করছে।

গণহত্যার বিচার, শহিদ পরিবারকে সহযোগিতা এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ এখনও খুবই দুর্বল। খুব সম্ভব এগুলো সরকারের কর্মতালিকার নিচের দিকে অবস্থান করে। এ কারণে একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যায় গত ১৩ নভেম্বর পঙ্গু হাসপাতালের সামনে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে সেদিন হাসপাতাল চত্বরেই ঘিরে ধরেছিলেন গণঅভ্যুত্থানের আহতরা। তারা জানতে চান–তাদের চিকিৎসায় কেন অবহেলা করা হচ্ছে, কেন তারা সরকার ঘোষিত সহযোগিতা এখনও পাননি। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা তার গাড়ি ফেলে বলতে গেলে একভাবে পালিয়ে যান সেখান থেকে। এরপর আহতরা পঙ্গু হাসপাতালের সামনের রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের সাথে যোগ দেন চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের আহতরা। এদের অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, অনেকে হারানোর পথে। দেশে তাদের আর চিকিৎসা সম্ভব নয়, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের দেশের বাইরে যাওয়া দরকার–কিন্তু সেরকম কোন উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেই।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। চাল থেকে সবজি–সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে ক্রমাগত। সরকার দাম নির্ধারণ করে দেয়ার মত উপর উপর কিছু পদক্ষেপ নিলেও সিন্ডিকেট বহাল তবিয়তেই আছে। একচেটিয়া বড় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

একথা দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেটে যুক্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, গার্মেন্টস মালিকদের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। হাসিনা সরকার পতনের পর দেখা যাচ্ছে, অনেক গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন দিচ্ছে না। অবাধে ছাঁটাই চলছে। কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। অভুক্ত শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামছে। সেই বিক্ষোভে যৌথবাহিনী গুলি চালিয়ে ইতোমধ্যে দু'জন গার্মেন্টস শ্রমিককে হত্যা করেছে। অব্যাহত শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের যৌথ বৈঠকে ১৮ দফা চুক্তি হয়। সেই চুক্তির দেড় মাস পরও দেখা যাচ্ছে ১৮ দফার প্রায় কিছুই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে গাজীপুর ও আশুলিয়ায় প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে পতিত ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দোসর খোঁজার প্রবণতাই বেশি। কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটনা হয়তো ঘটতেও পারে। সেক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সমস্ত আন্দোলনেই ষড়যন্ত্র খোঁজা–পূর্বের ফ্যাসিস্ট সরকারের বয়ানকেই মনে করিয়ে দেয়। অথচ এই ক'দিন আগেই এই শ্রমিকরাই ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে। তার পতনের জন্য রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। তাদের রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে আবার তাদেরই রক্ত ঝরছে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকারের হাতে। *২য় পৃষ্ঠায় দেখুন*

বাসদ (মার্কসবাদী)-এর উদ্যোগে সংলাপ

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ ও সংস্কার ভাবনা

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৪, বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর চৌধুরী মিলনায়তনে ‘গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ ও সংস্কার ভাবনা’ নিয়ে সংলাপের আয়োজন করে বাসদ (মার্কসবাদী)। দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন- অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, লেখক ও সাংবাদিক নূরুল কবীর, লেখক ও সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ, অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু ও ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। শুরুতে 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষ থেকে ৬টি সংস্কার কমিশনের কাছে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাবনার খসড়া সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়। বক্তারা পরবর্তীতে এই প্রস্তাবনাগুলোর উপর নিজেদের মতামত রাখেন। প্রস্তাবনায় সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন, নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রনয়ণ, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা, জনপ্রশাসন থেকে পৃথক স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনসহ সংস্কারের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বক্তারা অংশগ্রহণমূলক ও পারস্পরিক বিনিময়ের এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’ দলকে ধন্যবাদ জানান। উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা গভীর ও দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা রাখেন।

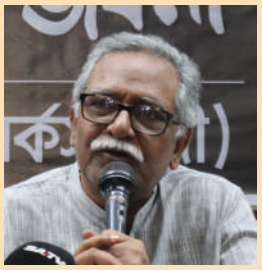

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

একাত্তর ও চব্বিশকে মুখোমুখি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতাটি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক। কী কারণে একাত্তর থেকে চব্বিশ বিচ্ছিন্ন হবে? একাত্তর এই জনপদের মানুষের জীবন ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিরোধের জায়গা, একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা। আমরা বহুবার প্রতারিত হয়েছি, কিন্তু এই আত্মবিশ্বাসের ধারাবাহিকতায় আমরা আবার লড়াই করেছি। একাত্তর আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। চব্বিশের এই অভ্যুত্থানের মধ্যে নানাভাবে একাত্তরের কথা এসেছে।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান

আইন করে বলে দেয়া হলো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পেতে হলে তার সারাদেশে এতগুলো জায়গায় অফিস থাকতে হবে, এত সমর্থক থাকতে হবে– এটা কেন? এটা হচ্ছে মানুষকে রাজনৈতিক দল না করতে বলা। এ সমস্ত আইন সংবিধানবিরোধী। কারণ সংবিধানে দেয়া মৌলিক অধিকারের মধ্যে আছে right to assembly, অর্থাৎ আমি অর্গানাইজ করতে পারব, সভা-সমিতি করতে পারব, পার্টি করতে পারব। যে আইন সরাসরি সংবিধানবিরোধী, সেই আইন তো আপনা-আপনি বাতিল হবে।

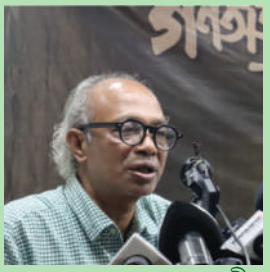

নূরুল কবীর

নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন হতো, তাহলে পাঁচ বছর ধরে প্রশাসনের সাথে ক্ষমতাসীন দলের বা প্রার্থীদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, সেটা থেকে আলাদা করে, সেই সম্পর্কটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদেরই তো প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের আইনগত ও প্রশাসনিক সেই ক্ষমতা নেই, অথচ রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সেই ক্ষমতার কথা বলা আছে।

আলতাফ পারভেজ

নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি নিয়ে ঢাকায় যে শোরগোল, হট্টগোল– সেটা নিতান্তই ঢাকার বিষয়। প্রান্তিক মানুষের কোন ইস্যু গণঅভ্যুত্থানের পরে এখনও ঢাকার প্রধান এজেন্ডা হয়ে উঠেনি। এটা হলো গণঅভ্যুত্থানের তিনমাস পরের বাস্তবতা। প্রান্তিক মানুষের সমস্যা ঢাকার প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেনি এখনও। আবার সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য গণঅভ্যুত্থানের পরে যতটা ইনক্লুসিভ হওয়া দরকার, তা কতটা ধরে রাখা গেছে, কতটা ধরে রাখা যাচ্ছে– সেটাও প্রচণ্ডভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা

সংস্কারের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দেখতে হবে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের যে আলোচনা চলছে তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে কি না। বৈষম্যবিরোধী কথাটা এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এসেছে, সমস্ত সংস্কার এই অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপের পথে যাচ্ছে কি না– সেটা খেয়াল রাখা দরকার।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া

উচ্চ আদালতে অস্থায়ীভাবে দুই বছরের জন্য বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। কারণ বিদ্যমান সরকার যদি নাখোশ হন এবং তারা যদি স্থায়ী নিয়োগ না পান– এই চিন্তা বিচারকদের মাথায় কাজ করে। দুই বছর হাইকোর্টের বিচারক থাকার পর না থাকাটা তো তাদের কাছে একটা বিব্রতকর ব্যাপার। আবার জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ করাটাও আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি। এসকল কর্মকান্ড গোটা বিচার বিভাগকে ধ্বংস করছে।

১ম পৃষ্ঠার পর

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিন মাস

গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি আওয়ামী লীগ ফিরে আসার চেষ্টা করছে। প্রায় দেড় হাজার মানুষকে হত্যার পরও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন অনুশোচনা দেখা যায়নি। তাদের বেশিরভাগ নেতারা এর জন্য অনুতপ্তও নন। বিভিন্ন মাধ্যমে যতটুকু বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু জনমনে আওয়ামী লীগের প্রতি যে ঘৃণা সঞ্চিত আছে, এখনো ক্ষোভের বারুদ সঞ্চিত আছে– তাতে ফিরে আসার চেষ্টা করলে জনগণই আবার তাদের প্রতিহত করবে। দল হিসেবে গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগকে ক্ষমা চাইতে হবে। হত্যা, গণহত্যা ও দুর্নীতিতে জড়িত নেতাদের বিচার হতে হবে। এরপর জনগণ ঠিক করবে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে।

ফলে গণঅভ্যুত্থানকে রক্ষার গ্যারান্টি এই জনগণ। সরকারের মধ্যে যারা আন্দোলনের স্পিরিটকে ধারণ করেন, তারা কোন সংকটে পড়লে তা দেশের জনগণের সামনে অকপটে উন্মোচন করা দরকার। জনগণকে জড়িত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যাওয়া দরকার। জনগণের শক্তি সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন না করে রাষ্ট্র শক্তি, আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাইলে– অভ্যুত্থানকারী জনগণের সাথেই তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে যার কিছু কিছু চিত্র দেখা যাচ্ছে।

অভ্যুত্থানের ৩ মাস পরে সরকার অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করছে সাংবিধানিক সংকটের কথা বলে। হঠাৎ কী সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হলো তা সরকার স্পষ্ট করছে না। এতে তাদের কর্মকান্ড ঘিরে জনমনে ধোয়াশা তৈরি হচ্ছে।

প্রথমত, এই অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতার ভিত্তি কেবল সংবিধান দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এর সবচেয়ে বড় ভিত্তি জনগণের নৈতিক সমর্থন, যা গণঅভ্যুত্থান থেকে উৎসারিত।

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে, যা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে করা হবে। সরকার কী করতে চায়, যা ক্ষমতার অভাবে করতে পারছে না– তাও স্পষ্ট করা উচিত।

তৃতীয়ত, এই অধ্যাদেশ করে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, উপদেষ্টাদের কর্মকান্ড নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এর মধ্য দিয়ে উপদেষ্টাদের একরকম দায়মুক্তি দেয়া হলো, যা তাদের জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

এই অধ্যাদেশ জারি, সম্প্রতি তিন উপদেষ্টার নিয়োগ–অন্তর্বর্তী সরকারের এ ধরনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষণীয়। দেশের জনগণ ও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে সাথে নিয়ে মতৈক্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত না হওয়ায় অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী জনগণ ও রাজনৈতিক বিভিন্ন শক্তির সাথে সরকারের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, যা সরকারের সমর্থনের ভিত্তিকে দুর্বল করছে।

এর আগে আমরা দেখেছি, দেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে– সেই লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, সংবিধান সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনসহ ১০টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও কোন মতামত নেয়া হয়নি। কিছু কিছু কমিশন কাজ শুরু করেছে। তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের জনগণকে মতামত দেয়ার আহ্বান করেছে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। একরকম দায়সারাভাবে কমিশনগুলো মতামত নেয়ার কাজ শুরু করেছে। সত্যিকারভাবে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত করছে না। কমিশনগুলোর কাজের অগ্রগতিও খুব ধীর গতির। অন্যদিকে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আসার আগেই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা নির্বাচন কমিশন আইন অনুসারে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি করেছে। ফলে সংস্কার সম্পর্কে অন্তর্বর্তী সরকারের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।

এরইমধ্যে এই সংস্কার, বিশেষত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন রকম বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। সুপরিকল্পিত বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভক্তির বীজ রোপণ করা হচ্ছে। বাহাত্তরের সংবিধানকে এককথায় 'মুজিববাদী সংবিধান' অভিহিত করে পুরো সংবিধানকেই খারিজ করে দিচ্ছেন কেউ কেউ। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর উৎসাহ ও মদদ যেমন আছে, তেমনি একটা অংশ বিভ্রান্তিতে পড়েও এর পক্ষে সায় দিচ্ছেন। তারা মনে করছেন, এই সংবিধানই ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার ভিত্তি। ফলে একে উপড়ে ফেলতে হবে। কিংবা এই সংবিধান বাতিল করলেই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ হবে।

একথা সত্য যে বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে যেভাবে সর্বময় একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে তা-সহ অন্যান্য অগণতান্ত্রিক ধারার সংস্কার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না সংবিধানকে যত আদর্শস্থানীয়ই করা হোক না কেন, যত ভালো ভালো কথাই এতে লিপিবদ্ধ করা হোক না কেন– তার দ্বারা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ হয় না। কারণ ফ্যাসিবাদের ভিত্তি সংবিধান নয়, দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এর ভিত্তি। যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় একটা দেশের সংবিধান সেই সমাজের ভিত্তিটা টিকিয়ে রাখতেই সহযোগিতা করে। পুঁজিবাদী দেশের সংবিধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভব নয়।

জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। এটাই বর্তমান মুহূর্তের করণীয়। না হলে অনুকূল জমিন পেলে ফ্যাসিবাদ আবার আগের চেহারায় ফিরে আসতে পারে।

ট্রাম্প বলছেন যুদ্ধ বন্ধ করবেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বন্ধের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন, অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ হবে, বিশ্বের সব যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তির সুবাতাস বইবে ইত্যাদি।

এটা ঠিক, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প আন্তরিক হলে ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে পারেন। কিন্তু সেজন্য আমেরিকার আগে ইসরাইলকে অস্ত্র ও অর্থ সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করতে হবে– যার বোঝা সাধারণ মানুষকেই বইতে হয়। ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূমি ফেরত, অবৈধ ইহুদি বসতি উচ্ছেদ, ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণ ও দখলমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া প্যালেস্টাইন সংকট সমাধান কি সম্ভব?

ট্রাম্প আজকে শান্তির কথা বললেও, ইতিহাস ভিন্ন কথা বলছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার পূর্বের মেয়াদে এ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির বীজ রোপণ করেছিলেন। জেরুজালেমকে ইসরাইল তাদের রাজধানী ঘোষণা করলে, ২০১৮ সালে তাতে স্বীকৃতি দেন ট্রাম্প। জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দূতাবাস খোলে। ট্রাম্পের কন্যা ইভানকা সে দূতাবাস উদ্বোধন করেন। সেসময় তারা ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত গোলান মালভূমি এলাকাকে ইসরাইলের অংশ বলে স্বীকৃতি দেন। ট্রাম্প ২০২০ তার তথাকথিত শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, তা ফিলিস্তিনিরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে প্রস্তাবে জেরুজালেমকে দেখানো হয়েছিল ইসরাইলের অংশ হিসেবে, ইসরাইলের দখলদারিত্বে উচ্ছেদ হয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

ট্রাম্প কি ইউক্রেনকে ঘিরে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বন্ধ ও ইউক্রেনকে অস্ত্র-অর্থ সহযোগিতা বন্ধ করে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার মধ্যস্থতা করবেন? ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে কী করেন, তা দ্রুত পরিষ্কার হবে। বিশ্ববাসী শান্তি চায়। তাই যুদ্ধ বন্ধের প্রত্যাশাটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে ব্যথিত অনেকেই ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধের আহবানে আশান্বিত হচ্ছেন। তারা তাদের শুভ প্রত্যাশার সাথে সাথে যুদ্ধ কেন হয়, যুদ্ধের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা কী– ইত্যাদিকে যদি নির্মোহ বিচার করতে না পারেন, তাহলে আশাহত হতে হবে।

যুদ্ধ কেন হয়? বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বজুড়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার দখল ও ভাগবাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং একে কেন্দ্র করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও টিকে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বজুড়ে বাজার সংকট আরো তীব্র হয়েছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই আজ ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে। উৎপাদনের পরিমাণে ঘাটতি না থাকলেও কেনার ক্ষমতা নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। ফলে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য সে অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে যাচ্ছে। রাষ্ট্র অস্ত্র কোম্পানিগুলো থেকে অস্ত্র কিনছে, সামরিক ব্যয় বাড়াচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে একটা কৃত্রিম তেজীভাব আসছে। আবার রাষ্ট্র অস্ত্র কিনে জমা করে রাখতে পারে না। তার অস্ত্র খালাস করা দরকার। এই অবস্থায় নিজে যুদ্ধ বাধিয়ে এবং অন্য দেশগুলিকে যুদ্ধে উস্কানি দিয়ে অস্ত্র ব্যবসার রাস্তা খুলে দেওয়া ছাড়া পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজেদের টিকিয়ে রাখার অন্য উপায় নেই। যুদ্ধে প্রাণ হারায়, নিঃস্ব হয় সাধারণ মানুষ; কিন্তু লাভবান হয় সব দেশের ধনিক, সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিপতি ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা। যুদ্ধ বন্ধ হোক, এটা তারা চায়না। চলমানযুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যুদ্ধকে পুঁজি করে যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা রমরমা। বিশ্বব্যাপী তাদের অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে।

'কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপন্সিবল স্টেট ক্রাফট' সম্প্রতি তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইসরায়েলের যুদ্ধ মানেই মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিশাল মুনাফা। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরাইলের হামলা শুরুর এক বছরে মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানি ও নানা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠাগুলোর উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। ইসরায়েলের অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানি লকহিড মার্টিন, আরটিএক্স, বোয়িং, ডায়নামিক্স, নর্থম্যান গ্রুম্যান আমেরিকান। এক বছরে লকহিড মার্টিনের রেভিনিউ প্রায় ৫৫% বেড়েছে। গাজাকে বোমাহামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করায় ইসরায়েল লকহিড নির্মিত 'এফ-৩৫' যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র নির্মাতা মার্কিন কোম্পানি আরটিএক্স (পূর্বে রেইথিয়ন)-এর রেভিনিউ গত একবছরে বেড়েছে প্রায় ৮৩ ভাগ। তার নির্মিত বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা, যা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যবহার নিষেধ, তা ইসরায়েল গাজা ও লেবাননে শরনার্থী শিবির ও আবাসিক এলাকায় ব্যবহার করে গণহত্যা চালাচ্ছে। আরেক মার্কিন কোম্পানি ডায়নামিক্সের রেভিনিউ বেড়েছে ৩৭%। ডায়নামিক্সের তৈরি 'বাঙ্কার বাস্টার বোমা', 'ব্লু-১০৯' দিয়ে লেবাননে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে।

অস্ত্র নির্মাতাদের পাশাপাশি ইসরাইলকে নানা সরঞ্জাম সরবরাহকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ও বেড়েছে। যেমন– ক্যাটারপিলার। গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যরা বোমায় বিধ্বস্ত বাড়ির ধ্বংসস্তূপ ও লাশের স্তূপ সরাতে ক্যাটারপিলারের তৈরি বুলডোজার ব্যবহার করা হচ্ছে। অস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম নির্মাণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল ও যুক্ত থাকে অনেক ধরণের ছোট বড় প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত বছর বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০২৩ সালে সর্বমোট ২৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে সামরিক খাতে নিজেও সর্বোচ্চ ব্যয় করা দেশটি। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের আশপাশের দেশগুলো নিজেদের সুরক্ষা জোরদার করতে নতুন অস্ত্র কিনছে। এই অস্ত্র বিক্রির মাত্রা ২০২২ সালের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশি। (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪)

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে এবং সৌদি আরবে বিক্রি বাড়ায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই জার্মানির অস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৪৮ বিলিয়ন ইউরো। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অস্ত্র বিক্রির এই পরিমাণ ৩০ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮ জুনের মধ্যে জার্মান সরকার অন্তত ৭.৪৮ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র রপ্তানি অনুমোদন করেছে। জার্মানির অস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ গত বছরও সর্বকালের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছিল। সে বছর ১২.২ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র বিক্রি করে দেশটি। (দৈনিক আমাদের সময়, ১ জুলাই ২০২৪)

রয়টার্স তাদের অক্টোবর, ২০২৩-এ করা এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপে অস্ত্র শিল্পের নতুন করে উত্থান হয়েছে এবং অস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। ফলে, অস্ত্র উৎপাদন বাড়াতে ইউরোপের অস্ত্র নির্মাতারা শ্রমিক খুঁজছেন। এমনকি তারা নতুন কর্মীদের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ শুরু করেছেন। শুধু তাই নয় তারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে চান।

ফলে যুদ্ধ মানেই অস্ত্র ব্যবসা চাঙ্গা হওয়া। যুদ্ধ মানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সৃষ্ট মন্দা থেকে বাঁচার জন্য কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিতে তেজী ভাব আনা। যুদ্ধ মানে গণহত্যা, মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষুধা, দারিদ্র, যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে জনগণের উপর কর বৃদ্ধি– যার বোঝা সাধারণ মানুষকেই বইতে হয়। যুদ্ধ মানে দেশের নিরাপত্তা, আত্মরক্ষার অধিকার ইত্যাদি ধুয়ো তুলে পুঁজিবাদী সংকটে বিপর্যস্ত গরীব মানুষকে তাদের সংকট ভুলিয়ে রাখা। ফলে আজ যখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্প যখন যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির প্রতিশ্রুতি দেন, তা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর সাথে শঠতা ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আজ দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী শান্তিপ্রিয় জনগণকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী জোর লড়াই ও ঐক্য।

সাম্যবাদ
১২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৪

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

- কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

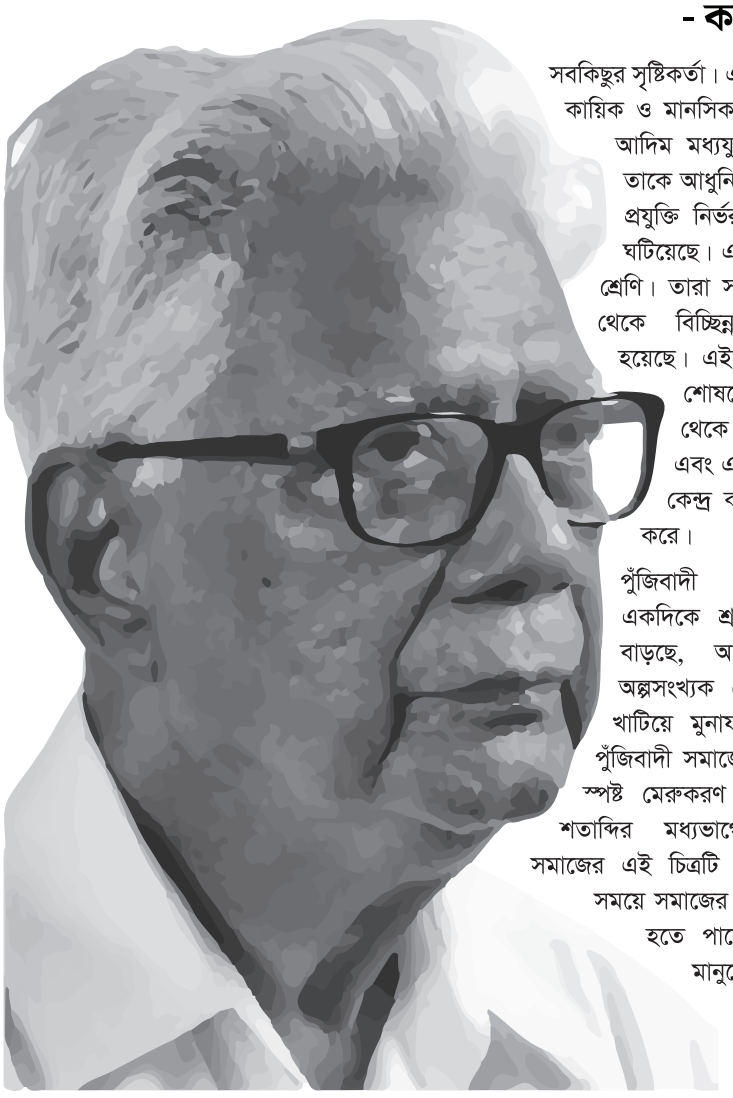

[২০১৫ সালের নভেম্বরে মহান রুশ বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী এবং আমাদের দল 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও রুশবিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেটে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি রুশবিপ্লব, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় রাজনীতি- এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই বক্তব্যসমূহ সংকলন করে ও পরবর্তীতে কমরেড মুবিনুল হায়দারের আরও কিছু সংযোজনীসহ এই বক্তব্যটি 'সাম্যবাদ' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখাটির অংশবিশেষ আমরা রুশবিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করছি।]

. . .পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব যে সমাজের সবকিছুকে আবর্তিত করছে– এটা কার্ল মার্কস আবিষ্কার করলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানব সমাজের অগ্রগতি কোন পথে হতে পারে, কোন শ্রেণিটি বিকাশমান, কোন শ্রেণিটি অবক্ষয়ী– সেটা মানুষের সামনে উপস্থিত করলেন। তিনি দেখালেন যে, পুঁজিবাদ এমন একটি শ্রেণির সৃষ্টি করেছে যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে এক নতুন শক্তির জন্ম দিয়েছে এবং এই শ্রেণিটিই এখনকার সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার সবকিছুকেই পরিচালনা করছে। তাদের শ্রমেই সবকিছু গড়ে উঠেছে এবং এটি ব্যক্তিগত শ্রম নয়, সামাজিক শ্রম। এই সামাজিক শ্রমই দুনিয়ার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এই শ্রমিকরা তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্য দিয়ে আদিম মধ্যযুগীয় সমাজ ভেঙে তাকে আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই শ্রেণিটি সর্বহারা শ্রেণি। তারা সমস্ত রকম সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বহারা হয়েছে। এই শ্রেণিটি পুঁজিবাদী শোষণের ফলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং এরা একমাত্র শ্রমকে কেন্দ্র করেই জীবন ধারণ করে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একদিকে শ্রমজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে, আরেকদিকে আছে অল্পসংখ্যক লোক, যারা পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। পুঁজিবাদী সমাজে এই দুটি শ্রেণির স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটছে। ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে কার্ল মার্কস সমাজের এই চিত্রটি তুলে ধরেন, এই সময়ে সমাজের বিকাশ কোন পথে হতে পারে তার নিয়মগুলি মানুষের সামনে রাখেন এবং কীভাবে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একদিন সমস্ত মানুষ সাম্যে যাবে, তার দিক নির্দেশ করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক নিয়ম। কল্পনা নয়, বাস্তব নিয়ম। মার্কস-এঙ্গেলস্ দুজনে মিলে মানব সমাজকে এই নতুন ধরনের বিজ্ঞানের ভিত্তি দিয়েছিলেন। এরপর দেশে দেশে তার অনুশীলন হয়। ১৯১৭ সালে, তখনকার সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদের দুর্বল গ্রন্থি রুশদেশে, কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বিপ্লব সম্পন্ন করে। লেনিন তখনকার সময়ে বুর্জোয়াদের যে পান্ডিত্য ও শিক্ষা, মার্কসবাদের উপর তাদের নানা আক্রমণ– ইত্যাদি মোকাবেলা করতে করতে বিশেষ দেশে, বিশেষ বিপ্লবের জন্য, বিশেষ পার্টির যে প্রয়োজনীয়তা তা নিয়ে আসেন এবং সেই বিশেষ পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা কেমন হবে, তা নির্দেশ করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতি, যা মার্কস-এঙ্গেলস এনেছিলেন, তাকে আরও উন্নত ও বিকশিত করেন। এরই প্রায়োগিক দিক ছিল রুশ বিপ্লব। রুশ বিপ্লব মানব সমাজে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লব দুনিয়ার সামনে একটি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে, তা হলো শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষরা, যারা পিছিয়ে পড়া, তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে এবং এটি দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের মুক্তির সংগ্রামে পথ নির্দেশক হিসেবে এসে যায়। এইভাবে সারা পৃথিবীতে তখন রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'– এই শ্লোগানকে সামনে রেখে তখন দেশে দেশে শ্রমিকরা এই বিপ্লবের জন্য কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি, সমস্ত বিষয়কে মোকাবেলা করার জন্য বিপ্লবীদের যে জ্ঞান দরকার, তার অভাবের সুযোগে বিপ্লববিরোধী শক্তি এর অভ্যন্তরে কাজ করতে থাকে। এটি হলো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি। এরা বুর্জোয়া শ্রেণি ও সর্বহারাদের মধ্যে আপোসকামী শক্তি। এরা নিজেদের সর্বহারা বলে পরিচয় দেয়, বাস্তবে বুর্জোয়াদের পক্ষেই কাজ করতে থাকে। শ্রমিকদের সুসংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে তারা বিভ্রান্তি ও বিভ্রম নিয়ে আসে। সকল দেশেই এই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিকে উন্মোচিত করতে করতেই সেই দেশের বুকে বিপ্লবী রাজনীতি মূর্তরূপে প্রকাশিত হয়। এ কাজটি লেনিন রুশদেশে করেছিলেন।

লেনিনের এই শিক্ষার ভিত্তিতেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হতে থাকে। মহান লেনিনের মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করে বেশ খানিকটা সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানি ও ইতালিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। সে সময় জার্মানি ও ইতালি দুটোই সাম্রাজ্যবাদী দেশ। দুই দেশেরই বাজার দখল করার দরকার। কিন্তু তার কোনো বাস্তবতা তখন ছিল না। কারণ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স– এ তিন দেশ তখন গোটা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। তারা বিশ্বের যে কোনো দেশে হস্তক্ষেপ করত, কর্তৃত্ব করত, কলোনি বানিয়ে শোষণ করত। তখন জার্মানি ও ইতালির বড় কোনো কলোনি ছিল না। ফলে তাদের ছিল তীব্র বাজার সংকট। তাদের দেশে গড়ে ওঠা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি খাটানোর আর কোনো জায়গা ছিল না। তাই বাজার দখল ছাড়া যখন তার বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই, তখন সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করতে লাগল। নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় অপমান-অবমাননাবোধ কাজে লাগিয়ে অন্য রাষ্ট্রের উপরে আধিপত্যবাদী মনোভাব তাদের মধ্যে গড়ে তুলল। এই রাষ্ট্রসমূহের পরিচালকরা মানুষকে তাদের পেছনে জড়ো করার জন্য বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটাকে গ্রহণ করল, কিন্তু জনগণের চিন্তাকে পুরনো ধর্মীয় কুসংস্কার-কূপমন্ডুকতায় আচ্ছন্ন করে রাখল। উগ্র জাত্যাভিমান গড়ে তুলে এক দেশের জনগণকে অন্য দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জন্মের পর ছিল একা। তাই তখন আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সে অর্জন না করতে পারলেও প্রতিবাদ করার শক্তি হিসেবে সে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই দুনিয়ার দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল এবং তা ক্রমশই পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই চলছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে চলছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই। এমন সময়ে জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন সোভিয়েত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিরাট শিল্পোন্নত দেশ জার্মানিকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং এক সময় পরাজিত করে রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা উত্তোলন করে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে চীন বিপ্লব সংগঠিত হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো, যেগুলো প্রথম আক্রমণেই জার্মানির কর্তৃত্বে চলে এসেছিল, সেগুলোতে কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিক জনতার ঐক্য শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতি পায়। তখন রাশিয়া, চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ– এই মিলে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠে। এই সময়ে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার এক বিরাট শক্তিকে মানুষ দেখল– যার প্রকাশ ঘটিয়েছিল রাশিয়া। আর তখন বিশ্বে সে একা নয়, একটা সমাজতান্ত্রিক শিবির সে গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন যে কোনো দেশের উপর যখন ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারত, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থানের পর তা আর সম্ভব হলো না। নভেম্বর বিপ্লবের পথেই এই অভ্যুত্থান ঘটে।

আরেকটি ব্যাপার সে সময় ঘটেছিল। সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসিত উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম শুরু হলো। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির কারণে চাইলেই সাম্রাজ্যবাদীরা এসব দেশে আগের মতো অত্যাচার-হত্যা- গণহত্যা চালিয়ে আন্দোলন দমন করতে পারে না, তখন ঔপনিবেশিক দেশসমূহ তাদের শক্তিতেই একে একে মুক্ত হওয়া শুরু করল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হলো। এ কারণে রুশ বিপ্লব শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

সেসময় একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির সারা পৃথিবীর শোষিত-নিষ্পেষিত-পরাধীন মানুষের মুক্তির কান্ডারী, সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে সে সাম্যের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, আবার একই সময়ে শোধনবাদী চিন্তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। লেনিন এ সম্পর্কে কিছু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্ট্যালিনও তাঁর জীবদ্দশায় শেষ কংগ্রেসে এই সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এগুলো ছিল ইঙ্গিত। এ সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক ও কার্যকরীভাবে বলেছেন এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। ১৯৪৮ সালেই তিনি বলেছিলেন, সাম্যবাদী শিবির আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে ঠিক; কিন্তু ভেতরে তাদের যে ঐক্য, যে সংহতি থাকা দরকার তা নেই; সমষ্টির স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থের যে বিরোধ–তাকে কীভাবে মীমাংসার দিকে নিয়ে যাবে, কোন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিয়ে যাবে–এসব প্রশ্নে তাদের বিভ্রান্তি আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশেষভাবে, কার্যকরীরূপে, কী ধরনের সমস্যার জন্য এরকম হচ্ছে– সেটা চিরে চিরে দেখিয়েছিলেন। এমনকি স্ট্যালিন জীবিত থাকাকালেও কমিউনিস্ট আন্দোলনে কী ধরনের দুর্বলতার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাও তিনি দেখিয়েছেন। 'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন,

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সারাদেশে রুশ বিপ্লবার্ষিকী ও দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ

রংপুর

নোয়াখালী

১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের যুব সংলাপ

বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে - "চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা: বৈষম্য ও বেকারত্বের সমাধান কোন পথে"- শীর্ষক যুব সংলাপ গত ১৯ অক্টোবর, টিএসসি মুনীর চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের সদস্য প্রেমানন্দ দাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন লেখক ও গবেষক মাহা মির্জা, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ যুব ফ্রন্টের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক রাশেদ শাহরিয়ার। সভায় বেকারত্ব ও বৈষম্য নিরসনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮ দাবি উপস্থাপন করা হয়।

'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর কেন্দ্রীয় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ দুইদিনব্যাপী বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দিক থেকে গণঅভ্যুত্থানের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ওপর গুলি-নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ছাত্র-শ্রমিক সমাবেশ

গত ১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ওপর গুলি-নির্যাতন বন্ধ এবং হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার করা, অবিলম্বে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ করা, সরকারের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের দায়িত্ব নেয়া এবং অবিলম্বে বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে শাহবাগে ছাত্র-শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের বিশেষ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য রেশনিং, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবিতে গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের বিশেষ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে মানস নন্দীকে সভাপতি ও মাসুদ রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

গত ১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায়সংগত আন্দোলনে যৌথবাহিনীর গুলি, শ্রমিক কাউসার হোসেন ও চম্পা খাতুনের হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যদের উপযুক্ত বিচার, ক্ষতিপূরণ, মিরপুরে শ্রমিকদের উপর গুলির প্রতিবাদ, ১৮ দফা বাস্তবায়নে গরিমসি, রেশনিং ব্যবস্থা চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে আশুলিয়া ফ্যান্টাসি কিংডমের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন সাভার-আশুলিয়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি শ্রমিকনেতা নয়া মিয়া টুলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রমিকনেতা রাজু আহমেদ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শাহ জালাল, আশুলিয়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি আলী আকবর, সানজিদা প্রমুখ।

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

রুশ বিপ্লব স্মরণে

প্রত্যেকে যতক্ষণ রুটি না পাচ্ছে ততক্ষণ কেউ কেক পাবে না

- আলবার্ট রিস উইলিয়ামস লিখিত, 'রুশ বিপ্লব প্রবাহ' থেকে সংকলিত

...বিপ্লবের বিজয়ে উল্লসিত মুখর শ্রমিক আর সৈনিকেরা গান গেয়ে দলে দলে গিয়ে স্মোলনির বড় হলঘরটায় চাপাচাপি ভিড় জমিয়েছে আর 'অরোরার' কামান গর্জনে ঘোষিত হচ্ছে পুরনো ব্যবস্থার মৃত্যু আর নতুনের জন্ম, তখন ধীর স্থিরভাবে মঞ্চে উঠলেন লেনিন, আর সভাপতি ঘোষণা করলেন, "এবার কংগ্রেসে বক্তৃতা করবেন কমরেড লেনিন।"

মানুষটির যে মূর্তি মনে মনে গড়ে তুলেছি তার সঙ্গে মেলে কিনা দেখবার জন্যে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম, কিন্তু রিপোর্টারদের টেবিল থেকে প্রথমে তাঁকে দেখতেই পেলাম না। হৈ চৈ, হর্ষধ্বনি, সিটি আর পা দাপানির মধ্যে তিনি মঞ্চ পার হয়ে তিরিশ ফুট দূরে বক্তার মঞ্চে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হর্ষধ্বনি উঠল চরমে। এবার তাঁকে স্পষ্ট দেখে আমরা হতাশ হলাম।

মনে মনে যে মূর্তি গড়ে তুলেছি তিনি তার প্রায় বিপরীতই ছিলেন। ভেবেছিলাম তিনি হবেন বিপুলকায় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দেখলাম বেঁটে খাটো উস্কোখুস্কো, এলোমেলো।

হর্ষধ্বনির ঝড়টাকে থামিয়ে তিনি বললেন,"কমরেডস, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের কাজটা এবার আমরা হাতে নেব।" তারপর তিনি আরম্ভ করলেন কাটখোট্টা ধরনের একটা আলোচনা– তাতে কোন উত্তেজনা নেই। তাঁর গলার স্বর রুক্ষ, শুকনো; বাকবিভূতি কিছু নেই। বগলের কাছে ভেস্টের মধ্যে বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে তিনি গোড়ালির উপর ভর করে সামনে-পিছনে দুলতে থাকলেন। কোন্ অজ্ঞাত চৌম্বক গুণে এই মুক্ত, তরুণ, বলিষ্ঠ মেজাজের মানুষগুলির উপর তাঁর এত প্রভাব সেটা লক্ষ্য করবার বৃথা আশায় এক ঘন্টা ধরে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম ।

আমরা হতাশ হলাম। বলশেভিকরা তাঁদের দরাজ মনীষিতায় আমাদের মন জয় করেছিলেন; আশা করেছিলাম তাঁদের নেতাও তাই করবেন। এ পার্টির নেতাকে আমাদের সামনে দেখব এইসব গুণের মূর্ত প্রতীক হিসাবে, সমগ্র আন্দোলনের মর্মবাণী রূপে, অতি-বলশেভিক গোছের একটা কিছু–এটাই আমরা চেয়েছিলাম। তার বদলে তাঁকে দেখাল যেন একজন মেনশেভিক, তাও খুব ক্ষুদে মেনশেভিক।

ইংরেজ সংবাদদাতা জুলিয়াস ওয়েস্ট ফিসফিস করে বললেন,"একটু ফিটফাট পোশাক হলে মনে হত কোন ছোট ফরাসী শহরের বুর্জোয়া মেয়র কিংবা ব্যাঙ্কার।" তাঁর সঙ্গীটি একটু টেনে টেনে বললেন,"ঠিকই, কাজটা বৃহৎই, কিন্তু মানুষটি যেন তার পক্ষে ক্ষুদ্রই।"

বলশেভিকরা যে বোঝা কাঁধে নিয়েছেন সেটা কত ভারী তা আমরা জানতাম। সেটা তাঁরা বইতে পেরে উঠবেন কি? শুরুতে তাঁদের নেতাকে শক্ত মানুষ বলে আমাদের মনে হলো না।

প্রথম দেখে যা মনে হল সেটা এই। তবু, গোড়ার এই বিরূপ মূল্যায়ন থেকে আরম্ভ করে ছয়মাস পরে দেখলাম, আমি ভস্কভ, নেইবুত, পিটার্স, ভলোদার্স্কি এবং ইয়ানিশেভেরই দলে, যাঁদের কাছে ইউরোপের পয়লা নম্বরের মানুষ আর রাষ্ট্রনায়ক হলেন নিকোলাই লেনিন।. . .

. . . সমাজ জীবনে লেনিন যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই একই শৃঙ্খলা তিনি দেখালেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও। স্মলনিতে সবার ভোজনের উপচার ছিল শ্যি আর বর্শ্চ, কালো রুটি, চা আর মণ্ড। লেনিন, তাঁর স্ত্রী আর বোনেরও পান ভোজন সাধারণত তাতেই চলত। বিপ্লবীরা কাজে লেগে থাকতেন দিনে বার ঘন্টা, পনেরো ঘন্টা করে। লেনিনের নিয়মিত কাজের সময় ছিল আঠার ঘন্টা, বিশ ঘন্টা। শত শত চিঠি লিখতেন নিজের হাতে। কাজে ডুবে তিনি নিজের খাওয়াদাওয়াটাও ভুলে যেতেন। লেনিন যখন কথাবার্তার মধ্যে থাকতেন সেই সুযোগে তাঁর স্ত্রী এক গেলাস চা নিয়ে এসে বলতেন,"এই যে কমরেড, এটা যেন ভুল না হয়।" দেশের সমস্ত মানুষের জন্যে যা বরাদ্দ ছিল সেই একই রেশনে লেনিন চলতেন। সৈনিকেরা আর বার্তাবহরা শুতো বড় বড় আসবাবহীন ব্যারাক গোছের কামরায়, লোহার খাটিয়ায়। লেনিন আর তাঁর স্ত্রীর বেলায়ও ছিল তাই-ই। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে, প্রায়ই জামা-কাপড় না ছেড়েই, যে কোন জরুরী অবস্থায় উঠে পড়াবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা এবড়োখেবড়ো কৌচে শুয়ে পড়তেন। লেনিন এইসব ক্লেশ নিজে ভোগ করতেন, সেটা কোন সাধুসন্যাসীর কৃচ্ছসাধনের মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নয়। তিনি শুধু কমিউনিজমের প্রথম নীতিটিকে পালন করছিলেন।

এইসব নীতির একটা ছিল এই যে, কোন কমিউনিস্ট কর্মকর্তার মাইনে গড়পড়তা শ্রমিকের মাইনের চেয়ে বেশি হবে না। সেটার সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা ছিল মাসে ৬০০ রুবল। পরে বাড়ান হয়েছিল।. . .

লেনিন যখন ন্যাশনাল হোটেলের তিন তলায় একটা কামরা নিয়েছিলেন, তখন আমিও ঐ হোটেলে থাকতাম। বিস্তৃত আর ব্যয়সাধ্য খাদ্য তালিকাগুলোর বিলুপ্তি হল নতুন সোভিয়েত রাজের প্রথম ব্যবস্থাগুলিরই একটি। বহু ব্যঞ্জনের জায়গায় দুটো ব্যাঞ্জন দিয়ে হতো এক এক বেলার খাবার। পাওয়া যেত স্যুপ আর মাংস কিংবা স্যুপ আর মণ্ড। যিনিই হোন–প্রধান কমিসারই হোন, আর রসুইখানার যোগানদারই হোন– তার বেশি নয়, কেননা কমিউনিস্টদের মূল নীতিতেই লেখা আছে, 'প্রত্যেকে যতক্ষণ না রুটি পাচ্ছে ততক্ষণ কেউ কেক পাবে না।' এক এক দিন জনসাধারণের জন্যে রুটিও পাওয়া যেত যৎসামান্য। তবু, প্রত্যেকেই পেত লেনিনের সমান। কখনও কখনও এমন দিন গেছে যখন রুটি একেবারেই ছিল না। সে দিন লেনিনের বেলায়ও হয়েছে রুটিহীন দিন।

আততায়ীর আক্রমণের পরে লেনিন যখন মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, চিকিৎসকেরা কিছু খাদ্য নির্দেশ করেছিলেন যা সাধারণ রেশন কার্ডে পাওয়া যায় না–শুধু বাজারেই কোন চোরাকারবারির কাছে কেনা যায়। বন্ধুবান্ধবের শত অনুনয় সত্ত্বেও, যা নিয়মিত রেশনের মধ্যে নেই তা ছুঁতে লেনিন অস্বীকার করলেন।

পরে লেনিন যখন ভাল হয়ে উঠছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী আর বোন তাঁর পুষ্টি বাড়াবার একটা ফন্দি আঁটলেন। লেনিন রুটি রাখতেন একটা টানা দেরাজে– সেটা টের পেয়ে, তাঁর অনুপস্থিতিতে ওঁরা মাঝে মাঝে চুপিসারে তাঁর কামরায় ঢুকে পড়ে ঐ ভাড়ারে একটুকরো রুটি রেখে আসতেন। কাজে মগ্ন হয়ে লেনিন টানা দেরাজে হাত ঢুকিয়ে এক এক টুকরো রুটি নিতেন এবং নিয়মিত রেশনের উপর কিছু যোগ করা হয়েছে তেমন সন্দেহ না করেই সেটা খেতেন।

ইউরোপ আর আমেরিকার শ্রমিকদের কাছে একখানা চিঠিতে লেনিন লিখেছিলেন,"আঁতাতের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে নিদারুণ যে দুঃখ দুর্দশা, অনশনের জ্বালা রাশিয়ার জনগণকে ভোগ করতে হচ্ছে তা আগে কখনও ভোগ করতে হয় নি।" কিন্তু, লেনিন যে জনগণের সম্বন্ধে লিখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি নিজেও ঐ একই ক্লেশ সহ্য করেছেন।

লেনিনের উপর দোষারোপ করা হয়েছে যে, তিনি যেন একটা মহান জাতির জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছেন, তিনি যেন রাশিয়ার রুগ্ন দেহে কমিউনিস্ট সূত্র প্রয়োগ করে বেপরোয়া পরীক্ষা চালাচ্ছেন। কিন্তু ঐসব সূত্রে তাঁর আস্থার অভাব ছিল, কেউ এমন অভিযোগ করতে পারে না। সেগুলিকে তিনি প্রয়োগ করছেন কেবল রাশিয়ার উপর তা নয়। প্রয়োগ করছেন নিজের উপরও। নিজের ওষুধ নিজেই সেবন করতে তিনি প্রস্তুত। দূর থেকে কমিউনিজমের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এক জিনিস। কিন্তু কমিউনিজম প্রবর্তন করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যেসব ক্লেশ-দুর্দশা আসে সেগুলিও সহ্য করা, যা লেনিন করেছেন, সেটা খুবই ভিন্ন এক জিনিস।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র পত্তনটাকে কিন্তু পুরোপুরিই বিষণ্ন রঙে চিত্রিত করা চলে না। রাশিয়ায় সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলির মধ্যেই শিল্পকলা আর অপেরার স্ফুরণ চলছিল। প্রেমেরও স্থান ছিল। হঠাৎ এক দিন বিদুষী কল্লন্তাই নাবিক দিবেঙ্কোকে বিয়ে করেছেন শুনে আমরা তো বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরে, নার্ভা জার্মানদের সামনে পশ্চাদপসরণের একটা নির্দেশ দিয়ে তিনি নিন্দিত হন। অপদস্থ হয়ে তিনি পদ এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন–তাতে লেনিনের অনুমোদন ছিল এবং স্বভাবতই কল্লন্তাই ছিলেন বিরূপ।

সে সময়ে কল্লন্তাইয়ের সঙ্গে একদিন কথার মধ্যে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, লেনিনও বুঝি গেলেন সেই চিরাচরিত খাতে– শিরায় ক্ষমতার বিষ ঢুকে তিনিও বুঝি মত্ত হলেন অহমিকায়। কল্লন্তাই বললেন, "আমি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছি, কিন্তু লেনিনের কোন কাজ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে বলে আমি ভাবতে পারি নে। কমরেড লেনিনের সঙ্গে যাঁরা দশ বছর কাজ করেছেন এমন কোন কমরেড তার মধ্যে লেশমাত্র স্বার্থপরতা থাকতে পারে বলে মনে করতে পারেন না।" . . .

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের দেশব্যাপী সদস্য সংগ্রহ চলছে

সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক একই ধারার শিক্ষার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গত ৪ দশক ধরে লড়াই করে আসছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীরণসহ শিক্ষার উপর শাসকশ্রেণির সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলমান আছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম দাবি ছিলো বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা। শিক্ষাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল বৈষম্য বিদ্যমান– তা দূর করা। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই লড়াইয়ে যোগ দিতে সংগঠনের সদস্য হওয়ার আহবান জানাচ্ছে ছাত্র ফ্রন্ট।

সন্ত্রাস-দখলদারিত্বের বিপরীতে ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করতে জেলায় জেলায় এলাকায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য সংগ্রহ চলছে।

গত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের গাজীরহাট ইউনিয়নে বন্যা পরবর্তী সংকট নিয়ে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত রায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শফি উদ্দীন কবির আবিদ, বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার সংগঠক সঞ্জয় কান্ত দাস, চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার দপ্তর সম্পাদক চম্পক বাউরী, অর্থ সম্পাদক নমিতা রায়, জেলা কমিটি সদস্য কমলা বেগমসহ বিভিন্ন বাগানের প্রতিনিধি বৃন্দ।

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিন্দু ঐক্য প্রসঙ্গে

সেগুলোর বিচার হওয়া উচিত।

অতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একাংশের যে ভূমিকা আমরা দেখছি, সেটা নিয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এই অংশটি হিন্দু ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন। তাদের মিছিলে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানও উঠছে। এই স্লোগানটি আগে কখনও উঠেনি। আর এটা সকলেই জানেন, ভারতে এটি হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির স্লোগান। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্লোগান, যা ভারতের অসাম্প্রদায়িক জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

অভ্যুত্থানের পরপরেই ভারতের বিজেপি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের বানানো গল্প আমরা প্রচার হতে দেখেছি। আমরা তখনও এর প্রতিবাদ করেছি। এগুলো সত্য ছিল না, এখনও যা প্রচারিত হচ্ছে তাও সত্য নয়। আমরা মনে করি, শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের সবচেয়ে বড় সহযোগী ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ এই বিষয় নিয়ে অপপ্রচার করার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে এই অভ্যুত্থানকে সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থান হিসেবে প্রমাণিত করতে চায়। তারা এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করে একটা হিংসাত্মক সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ও দাঙ্গার জন্ম দিতে চায়। শোনা যায়, এ কাজে তারা ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করছে ও তাদের প্রচারযন্ত্রে ব্যাপক প্রচার করছে।

সমাজঅভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা পরাজিত আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তি এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সক্রিয়। সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ হয়তো না বুঝেই এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। আমরা তাদের ভেবে দেখতে বলব, হিন্দু ঐক্যের ডাক দেয়া মানে পরোক্ষভাবে মুসলিম ঐক্যেরও ডাক দেয়া। দীপ্ত দে, রিপন শীল, হৃদয় তরুয়ারা হিন্দু ঐক্যের জন্য প্রাণ দেননি, প্রাণ দিয়েছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ধরনের ধর্মভিত্তিক ঐক্য জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে, দেশকে বিভক্ত করে। এটা কোন গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য হতে পারে না। আর একটা দেশে সংখ্যালঘুরা কতটা নিরাপদ সেটা নির্ভর করে সেদেশে কতটুকু গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে তার উপর। বিভক্তির উগ্র স্লোগান গণতান্ত্রিক পরিবেশ নির্মাণে সহযোগী হয় না, আর সেই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ আবার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার পরিবেশ অভ্যুত্থানের সময় দেশে তৈরি হয়েছিল- এই সময়ের পদক্ষেপগুলো তাকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এতে অনেক সহযোগী মনোভাবাপন্ন মানুষ বিরূপ হচ্ছেন- এটি কোনভাবেই কাম্য নয়।

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি নগ্নভাবে মুসলিম বিরোধী হিন্দু ঐক্যের স্লোগান দিচ্ছে এবং মুসলিমবিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশের এরকম কোন রাজনৈতিক দল হিন্দুবিরোধী, সংখ্যালঘুবিরোধী মুসলিম ঐক্যের স্লোগান আজও দেয়নি। হিন্দুদের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে প্রচার এখনো চালায় নি।

সকল সরকারের আমলেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারও হিন্দুদের বন্ধু ছিল না। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে, ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী নয় বছরে (আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের নয় বছর), সারাদেশে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হামলা হয়েছে। এর কোনটারই বিচার হয়নি। পূর্ববর্তী বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার কোন ঘটনার বিচারও আওয়ামী লীগ করেনি, যদিও সেদিন তাদের কান্নায় চারপাশের সকল শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িকতা এই উপমহাদেশে একটি বড় সমস্যা। এটা মোকাবেলা ও নির্মূলের পথ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া নয়, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে শক্তিশালী করা। কিছু সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভূমিকার জন্য সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, সমাজে বিদ্বেষ বাড়ছে। ইসলামী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো যে কাজগুলো করে, একই ধরনের পাল্টা হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও স্লোগান দিয়ে সাম্প্রদায়িতা মোকাবেলা করা যাবেনা। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চিন্তা ও সংগঠনের প্রসার ঘটিয়েই সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করতে হবে।

একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি-লুটপাট-স্বজনপ্রীতি, শিক্ষা-চিকিৎসাকে দুর্মূল্য করে দেয়া- ইত্যাদি জনজীবনের সকল জ্বলন্ত সমস্যা মুসলমান-হিন্দু-সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সমানভাবে আক্রান্ত করছে এবং সকলেই এ কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। জনজীবনের সমস্ত সমস্যা সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই আক্রান্ত করে। এই সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই ও তার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটা পরিবর্তনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে।

ঐক্যবদ্ধভাবে জনজীবনের সাধারণ সংকটগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠা সম্ভব- এটা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আপামর শোষিত জনগণ তথা শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গণঅভ্যুত্থানে গড়ে উঠা ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সেটা আরেকবার প্রমাণ করেছে।

৭ম পৃষ্ঠার পর

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

ফলে, বাজারের উপর বা লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না বলে সাময়িকভাবে 'রিসেশন' বা বাজার-মন্দার চাপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই পরিকল্পনার আবার একটা কনট্রাডিকশন বা উল্টোদিক আছে। তা হলো এই যে, যত মাল বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকবে- সেগুলি যদি বসে থাকে, অর্থাৎ সেগুলি যদি খালাস করা না যায়, তাহলে মাল ক্রমাগত জমতে থাকার ফলে অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের ঝোঁকের (টেন্ডেন্সি অব স্ট্যাগনেশন) জন্ম হবে এবং এর ফলে সামরিক শিল্পেও আবার লালবাতি জ্বলতে শুরু করবে। অথচ সরকার বিনা প্রয়োজনে এই মালগুলো কিনে গুদামজাত করতে পারে না। কাজেই এই মাল খালাস করার প্রয়োজনেই তাদের চাই স্থানীয় ও আংশিক যুদ্ধ।"

তাই আজ দেখা যায়, অর্থনীতির সামরিকীকরণই সকল বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বিশ্বের মোট জিডিপির ২২ শতাংশের যোগানদাতা হলো আমেরিকা। কিন্তু এ দিয়ে আমেরিকার অর্থনীতিকে বোঝা যাবে না। ঐ বিশাল অর্থনীতি আজ কাঁপছে। আমেরিকার অর্থনীতির আকার ১৭.৮৪১ ট্রিলিয়ন ডলার। আর তার ঋণের পরিমাণ ১৮.১ ট্রিলিয়ন ডলার। আজ আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত জাতি। অথচ সে বাহ্যিকভাবে মহাশক্তি নিয়ে আছে। সেটি অস্ত্র উৎপাদনের মধ্য দিয়ে গায়ের জোরে অন্য দেশের উপর হামলা করে। বাস্তবে তার গোটা অর্থনীতিই যুদ্ধ অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে চোরাবালির উপর দাঁড়ানো। যে কোনো সময় ধ্বসে পড়ল বলে।

আমেরিকার ১৬টির বেশি গোয়েন্দা সংস্থা আছে দেশে-বিদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর জন্য। যেখানে এক লক্ষ সাত হাজারেরও বেশি লোক কাজ করে। সম্প্রতি কাউন্টার টেরোরিজম সিস্টেমে নতুন করে দশ হাজার লোক নেওয়া হয়েছে। এরা হলো আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বাইরের লোক। আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে দশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। এগুলো হলো গোটা ডিফেন্স সিস্টেমে সরাসরি যুক্তদের একটি গড় হিসাব। তাও যে সকল তথ্য প্রকাশিত, সেগুলো অনু সারে। এর সাথে যুক্ত হবে এই বিরাট অস্ত্র উৎপাদনের সাথে সহযোগী শিল্প ও ব্যবসাসমূহ। সেখানে যুক্ত আরও লক্ষ লক্ষ লোক। ডিফেন্স বাজেট কমানোর কথা কংগ্রেসে এক সদস্য বলেছিলেন, কয়েকজন তাকে সমর্থনও করেছিলেন। অস্ত্র কোম্পানির মালিকেরা তাতেই চোখ রাঙিয়ে বললেন, তাহলে আমেরিকায় এক ধাক্কায় মিলিয়ন মিলিয়ন লোক বেকার হয়ে যাবে। এই হলো আমেরিকার শিল্পোন্নতির নমুনা।

আমরা আগেই বলেছি, অস্ত্র উৎপাদন চালু রাখতে হলে তাকে খালাসও করতে হবে। এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। আজ আমেরিকা সারা বিশ্বে আংশিক ও খন্ড যুদ্ধ চালু রেখেছে। আমেরিকা যে সারা দুনিয়া ঘুরে সবার ভালো করতে চায়, সবার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে যে ছটফট করে, ছুটে যায়– তার আসল রহস্য এখানে। তার অস্ত্র খালাসের প্রয়োজনে সে এর খবর তাকে বলে, ওর খবর একে দেয়, খবর তৈরি করে, খবর বিক্রি করে, এর বিরুদ্ধে তাকে লাগায়। অর্থাৎ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ না থাকলে তার অর্থনীতি চোখ বুজবে।

তাই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে, তাকেই আবার অস্ত্র সরবরাহ করে। অর্থাৎ এ যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়। বিজয়ী হলে যুদ্ধ থেমে যাবে। তাই জয় দরকার নেই, যুদ্ধ দরকার। আইএস-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আবার রাশিয়া আইএস ঘাঁটিতে টানা হামলা মৌলবাদের হাত থেকে মানবতা রক্ষার জন্য করেনি। একদিকে আসাদের পতন ঘটলে ও সিরিয়ায় মার্কিন আধিপত্য তৈরি হলে রাশিয়ার জন্য ভীষণ সমস্যা, আবার তার অস্ত্রও খালাস হওয়া দরকার। আমেরিকার পরে সে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশ। আমেরিকা বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানির ৩১ শতাংশের যোগানদাতা, রাশিয়া ২৭ শতাংশের। তাই তারও যুদ্ধ দরকার।

গোটা দুনিয়ায় যখন যাকে দরকার তাকেই আক্রমণ করছে আমেরিকা ও ন্যাটো জোট, যেখানে আছে বড় বড় পুঁজিবাদী দেশসমূহ। তার জন্য কোনো কারণ দেখানোর দরকার নেই। পত্রিকায় একটা কিছু বললেই হলো। তার ঠিক-বেঠিকেরও ব্যাপার নেই। ভুল অভিযোগ তুলে ইরাক আক্রমণ করে গোটা ইরাককে তছনছ করে দেওয়া হলো। আজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার স্বীকার করছেন, সেটি ভুল ছিল। তাহলে কেন আক্রমণ করা হলো? কারণ আক্রমণ না হলে, যুদ্ধ না হলে তাদের অর্থনীতি বাঁচবে না।. . .

ফিলিস্তিন ও লেবাননে ইসরায়েলী গণহত্যার প্রতিবাদে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটির সমাবেশ ও গণমিছিল

গত ৭ অক্টোবর, ২০২৪ ঢাকার শাহবাগে ফিলিস্তিন ও লেবাননে ইসরায়েলী গণহত্যার প্রতিবাদে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ-এর সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা।

নিত্যপণ্যের দাম কমানোর দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভ

গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবে নিত্যপণ্যের দাম কমানো, রেশনিং ব্যবস্থা চালু, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটানো, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করে অবিলম্বে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট-এর প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও মিছিল অনুষ্ঠিত।

সাম্যবাদ
১২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৪

৩য় পৃষ্ঠার পর

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এখন আর আগের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা যাকে ইচ্ছা তাকে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু কমিউনিস্টদের উন্নততর চেতনা, মূল্যবোধ ও মার্কসবাদী রাজনীতি আরও সঠিকভাবে ধারণ করার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা আছে। এগুলি বিপদ হিসেবে সামনের সময়ে আসবে। আর বাস্তব ইতিহাস হলো এই যে, সেই ত্রুটিগুলি না শোধরানোর কারণে একসময়ে দৃষ্টান্তমূলক শক্তি হিসেবে মানব সমাজের সামনে বহুরকম কার্য সম্পাদনকারী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একসময় পতন ঘটল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্কের যে প্রভাব, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে যে অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে, সেটাকে কেন্দ্র করে তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে উপনীত হতে হয়, ঐক্যে পৌঁছাতে হয়– তৎকালীন সময়ে তা ঘটেনি। ফলে পার্টিসমূহের মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। এই যান্ত্রিক সম্পর্ক, আদর্শগত ক্ষেত্রে অনুন্নত অবস্থা তৈরি করে। কারণ এক সময়ের বড় আদর্শও যদি ক্রমাগত বিকশিত না করা হয়, তবে অন্য এক সময় সে হয়ে পড়ে অকার্যকরী। কমিউনিস্ট দলগুলোর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে আদর্শগত উন্নয়নের এ প্রক্রিয়াটি তখন কার্যকরী ছিল না।

আবার সমস্ত বিশ্বেই ব্যক্তিবাদ তখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল, তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এসে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব, সেটির বাস্তবিক সমাধান কীভাবে হবে– কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সে সম্পর্কিত কোনো পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্র বাস্তবে এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে যেটি সমষ্টিগত স্বার্থঅধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগতভাবে চাইবার যে অধিকারবোধ, সেটা বুর্জোয়া সমাজ থেকে পাওয়া। সমাজতন্ত্রে সে অধিকারের প্রশ্ন নেই। কারণ শ্রমজীবী মানুষই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মালিক। তাদের যদি কোনো অভাব থাকে, তবে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতা-যোগ্যতা অর্জন করে সেই অভাব দূর করার সংগ্রাম করবে, ব্যক্তিগতভাবে কিছু চেয়ে সমাজের সাথে বিরোধ করার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ তার কোনো ভিত্তিই সে সমাজে নেই। পুঁজিবাদী সমাজে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণি বেশিরভাগ মানুষকে ঠকিয়ে সমস্ত অধিকার একাই ভোগ করে, তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ব্যক্তিগত অধিকারের দাবি তুলতে হয়, তার কোনো অস্তিত্বই সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। পুঁজিবাদী সমাজের বঞ্চনার কোনো ভিত্তিই সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিরাজ করে না। ফলে সেখানে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির অধিকার নিয়ে কোনো লড়াই থাকতে পারে না।

সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ এবং তার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দেওয়া– সেটা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমাজের দিতে না পারার যে সীমাবদ্ধতা– সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি নয়, সেই অভাব সে অতীত সমাজ থেকে নিয়ে এসেছে। কারণ সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যবস্থায় সামাজিক কোনো বাধা নেই ব্যক্তিগত অধিকারের। শুধু ব্যক্তি যা চায়, তা দেওয়ার মতো সক্ষমতা সামাজিকভাবে তৈরি হয়নি– এই পার্থক্য। তাই ব্যক্তির প্রয়োজনমতো সমাজের দেওয়ার যে ক্ষমতা– যৌথভাবে, ক্রমাগত সংগ্রাম করতে করতেই তা অর্জিত হতে পারে। এই অভাব যখন সামাজিকভাবে দূর হবে, তখন ব্যক্তিগতভাবেও ব্যক্তি সে অভাব থেকে মুক্ত হবে। আবার এ কথাও ঠিক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যসমূহ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বও থাকবে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা কীভাবে হবে? মানুষের ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির উচ্চতর সংগ্রাম– এর মধ্য দিয়ে তাদের চেতনাকে এমন উন্নত স্তরে তুলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু অভাব তার আছে তা দেওয়ার ক্ষমতা সমাজের যে নেই, সেটা কোনো বিপরীত শ্রেণির শোষণের জন্য নয়। সেজন্য প্রতিটি মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী সে সমাজের কাছ থেকে পাবে। আর নৈতিকভাবে সে সামাজিক স্বার্থের সাথে অভিন্ন হওয়ার সংগ্রামে যুক্ত থাকবে। এইভাবে বৈষয়িকভাবে সমাজের যে দেওয়ার ক্ষমতা, সেটা ক্রমাগত বিকশিত হতে হতে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ার ক্ষমতা সে অর্জন করবে। আবার মানুষের মননশীলতাও সেই স্তরে উন্নীত হবে যে, সে বুঝতে পারবে, সামাজিক স্বার্থের ব্যক্তিস্বার্থকে একীভূত করার মধ্য দিয়েই ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তখনকার সময়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে থাকা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তা বুঝতে পারলেন না। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতিই তারা ধরতে পারলেন না। তখন যেভাবেই হোক উৎপাদন বাড়াবার ঝোঁকে তারা শ্রমিকদের ইনসেনটিভ দেওয়া শুরু করলেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বিপজ্জনক জিনিসকে ক্রুশ্চেভ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এলেন।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েতের নেতৃত্বে এলেন। তিনি এসেই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে ব্যক্তি স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করা শুরু করলেন। স্ট্যালিন এমন একটি নাম, যে নামের সাথে সমাজতন্ত্রের এক মহিমাময় যুগের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনের চিন্তার যে কার্যকারিতা, তার সবচেয়ে উন্নত উপলব্ধি ছিল স্ট্যালিনের মধ্যে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল। তার মর্মে আঘাত করে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার মধ্য দিয়ে তারা লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধিরই গন্ডগোল করে দিলেন। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অথরিটিকেই অস্বীকার করে বসলেন এবং সংশোধনবাদ প্রবেশ করার দ্বার উন্মোচন করে দিলেন। স্ট্যালিনের বিরাট ভূমিকা সারা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামকে যেমন উদ্বুদ্ধ করছিল, তেমনি অন্ধতাও তার মধ্যে জড়িয়ে ছিল। অর্থাৎ তাঁকে মানার মধ্যেই এক ধরনের অন্ধতা ছিল, সেটা তাঁর জীবিতকালেই ঘটেছিল, যেটি তাঁর বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকাকে ঠিক ঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। বিপ্লবী সংগ্রামে লেনিনের চিন্তাকে স্ট্যালিন যেভাবে ধারণ করতেন, তার পারসনিফিকেশন তিনি যেভাবে ঘটিয়েছিলেন, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তা ধসে পড়ল। এর মানেই হলো স্ট্যালিন যেভাবে লেনিনকে ধারণ করতেন, যৌথভাবে তা ধারণ করার মতো সংগ্রাম দলের অভ্যন্তরে হয়নি। সে সংগ্রাম অনেকখানি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। চিন্তার এই অনুন্নত মানকে কেন্দ্র করে ক্রুশ্চেভের মতো টেকনোক্র্যাট, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ লোক নেতৃত্বে এসে গেলেন। স্ট্যালিন যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে অভিন্ন ছিলেন, ব্যক্তি স্ট্যালিন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে কোনো ফাঁক ছিল না, এটি তখনও তত্ত্বগতভাবে আসেনি। অর্থাৎ কমরেড শিবদাস ঘোষ যেভাবে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসেবে ব্যক্তি নেতৃত্বের আবির্ভাবের কথা বলেছেন, সেভাবে বিষয়টি আসেনি। সে কারণে স্ট্যালিনকে তারা মেনেছে অন্ধভাবে, বাতিল করেছেও অন্ধভাবে। এ পুরো কাজটিই হলো ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে। একদিকে দলের মধ্যে যান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য বিরাট আত্মত্যাগ, অনেক নেতাকর্মীর মৃত্যু– এই সুযোগে ক্রুশ্চেভ পার্টির নেতৃত্বে চলে এলেন। ক্রুশ্চেভ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্ট্যালিনের অথরিটিকেই ধ্বংস করে দিলেন।

এই প্রক্রিয়ায় সংশোধনবাদ সোভিয়েতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করল। এই মহাশক্তিকে সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ করে হারাতে পারেনি। ভেতরের দুর্বলতার কারণে তার পতন ঘটল। কেউ কেউ বলবেন হেরে গেল। হেরে যায়নি, ভেতরের দুর্বলতার কারণে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই বুঝতে পারবেন, যে সমাজ মানুষের সামনে এগোবার ইতিহাস রচনাকারী, একেবারে নতুন সমাজব্যবস্থা হিসেবে যেহেতু সেটি দুনিয়ায় এসেছিল, তাকে ধারণ করার অভিজ্ঞতাজনিত ঘাটতির জন্য সে টিকে থাকতে পারল না। এভাবে সভ্যতার প্রতি ক্ষেত্রে নানারকম সংকট কাটিয়ে কাটিয়েই একটি নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এটিই সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে সামনে এগোবার রাস্তায় প্রবল বাধা থাকে। তখন মানুষ এক পা পিছিয়ে আবার এগোতে থাকে। তাই পিছানোটা বড় সমস্যা নয়। বিচার করে দেখতে হবে বিকাশের পথে সমাজতন্ত্র অনিবার্য কিনা। সমাজের এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নীত হওয়ার নিয়ম আছে। সেটি মানুষের চিন্তানিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। বস্তুজগতের (সে প্রাণীর বিকাশই হোক কিংবা সমাজের) বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষের চেতনার ভূমিকা এই যে, চেতনা বস্তুর বিকাশের সেই নিয়মের উপর ক্রিয়া করে তাকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু মানুষের চেতনার উপর নির্ভর করে বস্তুজগৎ বিকশিত হয় না। বিকশিত হয় তার নিজস্ব নিয়মের দ্বারা। ফলে সমাজ বিকাশের অনিবার্য নিয়মে সমাজতন্ত্র আসতেই হবে। দেশে দেশে গড়ে ওঠা শ্রেণি সচেতন বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে পরিণতি পাবে।

আজকের যুগে অর্থাৎ লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এ যুগে বিশ্বপুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সংকট আগের চেয়ে আরও ব্যাপক, ভয়াবহ ও জটিল রূপ ধারণ করেছে।

১৯১৬ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ– পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইটিতে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের উষালগ্নের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ আর নেই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি কাঁচামাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্প পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে ও তা তুলনামূলক সস্তা শ্রমের দেশগুলোতে খাটাচ্ছে। এভাবে পুঁজি রপ্তানি করে অন্য দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করার এই চরিত্রটি ছিল পুঁজিবাদের পূর্বতন বৈশিষ্ট্য থেকে নতুন এবং লেনিন এর নাম দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ। লেনিন বলেছিলেন, এই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। এরপর পুঁজিবাদের বিকশিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এই সাম্রাজ্যবাদীরা বাজার সংকটে পড়ে বাজার দখলের জন্যই দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। কারণ এই প্রক্রিয়ায়ই পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হবে, এ ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছিলেন,

> The war of 1914-18 was imperialist (that is, an annexationist, predatory, war of plunder) on the part of both sides; it was a war for the division of the world, for the partition and repartition of colonies and spheres of influence of finance capital. (Imperialism: The highest stage of capitalism)

আজকের এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগবৈশিষ্ট্য এক থাকা সত্ত্বেও তার মাত্রা আজ একই রকম নেই। লেনিনের সময় থেকে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সংকট আরও প্রকট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সব রকম সংকট সত্ত্বেও পুঁজিবাদের যে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল, তা আজ আর নেই। সে এখন প্রতি মুহূর্তে সংকটে পড়ছে, তা থেকে বাঁচার জন্য সে যে রাস্তা বেছে নিচ্ছে, তা তাকে আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত করছে। এককথায় পুঁজিবাদের সংকট আজ এবেলা- ওবেলার সংকটে পরিণত হয়েছে। সংকট থেকে বাঁচার জন্য পুঁজিবাদ দেশে দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ সমস্তশিল্প যখন মন্দায় ডুবছে, তখন ব্যাপক পরিমাণে সামরিক শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই প্রবণতাটি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে বোঝায়, সরকার যেখানে নিজেই অর্ডার দেয়, আবার সেই মাল সরকার নিজেই কেনে। উৎপাদিত মাল বিক্রির জন্য বাজারের উপর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। শুধু সামরিক খাতে সরকারের বাজেট বাড়তে থাকে। ফলে, মন্দা- অর্থাৎ, যাকে আমরা বলি বাজার নেই, কাজকর্ম নেই, অর্ডার নেই- এই সমস্যার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও শিল্পগুলো বাঁচে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সরকার নিজেই 'প্লেন' তৈরি করার, 'ফাইটার' তৈরি করার এবং নানা সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করার অর্ডার দেয়, আবার এই তৈরি মালগুলো সরকারই কেনে। *৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন*

সাম্যবাদ
'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

১২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৪

রুশবিপ্লব বার্ষিকী ও 'বাসদ (মার্কসবাদী)'—এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় সমাবেশে বক্তারা

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির উপস্থিত থাকলে ফিলিস্তিনে এই গণহত্যা সম্ভব ছিল না

গত ৮ নভেম্বর, শুক্রবার, বিকাল ৪টায়, শাহবাগে রুশবিপ্লব বার্ষিকী ও দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে ও নির্বাহী ফোরামের সদস্য রাশেদ শাহরিয়ারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত। আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রেজা।

বক্তব্যে মাসুদ রানা বলেন, "১০৭ বছর আগে পৃথিবীর বুকে সর্বহারা শ্রেণি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য কেবলমাত্র রাশিয়ার মাটিতে সীমাবদ্ধ ছিলো না, দুনিয়ার দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের কাছে এনেছিলো মানবমুক্তির এক নতুন বার্তা। পৃথিবীর সকল ধর্মের মহামানবগণ তাদের চিন্তায় ও ধারণায় যে সমাজের কল্পনা করেছিলেন, নভেম্বর বিপ্লব ছিল তারই মূর্তরূপ। মহান লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক সমাজ, যেখানে দারিদ্র ও ক্ষুধা নেই। নেই বেকারত্ব ও অশিক্ষা, নেই ভিক্ষা ও পতিতাবৃত্তি। শিক্ষা ছিলো বিনামূল্যে, চাকুরি ছিলো নিশ্চিত। বেঁচে থাকার কোন উপকরণের অভাব ছিলো না। নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিশুরা পেয়েছিল অবাধ বিকাশের অধিকার। বিশ্বের বড় বড় মনীষীগণ দুইহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই সমাজ ব্যবস্থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিপরীতে মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিলো এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিলো যুদ্ধবিরোধী শান্তিশিবির। এর ফলে এককভাবে যুদ্ধ বাঁধানোর ক্ষমতা আর সাম্রাজ্যবাদীদের ছিলো না। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির আগের সেই শক্তি নিয়ে উপস্থিত থাকলে ফিলিস্তিনে এই গণহত্যা ইসরায়েল চালাতে পারতো না। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপর একের পর এক হামলা সম্ভব ছিল না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অবশ্যই রুখে দাঁড়াতো।

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান থেকে বৈষম্যবিরোধী যে বক্তব্য বারবার সামনে এসেছে, সেটি বাস্তবায়ন সম্ভব একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। এই লড়াইয়ে দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি জনতাকে যুক্ত হতে হবে।"

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ভারতীয় মিডিয়ার প্রচার ও হিন্দু ঐক্য প্রসঙ্গে

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সম্প্রীতির প্রশ্নটি আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের ব্যানারে চট্টগ্রামের লালদিঘীর ময়দানে সমাবেশের পর বিষয়টি আরেক মাত্রা নিয়ে সামনে আসে। এই সমাবেশের পর ৮ দফা দাবি, গেরুয়া পতাকা, জয় শ্রীরাম স্লোগান ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এটি সংবেদনশীল, কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা এ কারণে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। হিন্দু সম্প্রদায়ের সচেতন অংশকে ও সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ও যুক্তিশীল মানুষকে খোলামনে আমাদের বক্তব্যটা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব।

এই গণঅভ্যুত্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, আহত হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। শহিদ দীপ্ত দে ছিলেন মাদারীপুর সরকারি কলেজের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক, এই আন্দোলনে মাদারিপুরের প্রথম শহিদ তিনি। হাসিনার গণহত্যার প্রতিবাদে হবিগঞ্জের রিপন চন্দ্র শীল আড়াই মাসের সন্তান ঘরে রেখে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে নেমে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন তার ভাই শিপন শীল আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এখন আহত ও শয্যাশায়ী। গণঅভ্যুত্থানের স্ট্যালিনগ্রাদখ্যাত যাত্রাবাড়িতে প্রাণ দেন দুই সন্তানের পিতা সৈকত চন্দ্র দে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তারোয়া, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুদ্র সেন, ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপের কথা পত্রিকার পাতায় এসেছে বারবার।

অভ্যুত্থান পরবর্তীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বাসাবাড়িতে আক্রমণের কিছু ঘটনা ঘটেছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মাজারে হামলা হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। দেশের বেশিরভাগ মানুষই তা করেছে। আবার সে সময়ে আমরা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় পাহাড়া দিতে দেখেছি, এলাকায় এলাকায় টিম করে এলাকাবাসীকে পাহাড়া দিতে দেখেছি। একটা সম্প্রীতির পরিবেশ তখন গড়ে উঠেছিল।

আমরা তখন বলেছি যে, তিন ধরনের শক্তি এই কর্মকান্ড চালিয়েছে। একটা হচ্ছে সুযোগসন্ধানী শক্তি, যারা কোনকিছু ঘটলেই সেখান থেকে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। আরেকটি হচ্ছে, পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি, যারা গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে– এটা প্রমাণ করতে চায়। তারা এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তৃতীয়ত, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি, যারা সুযোগ পেলেই এ ধরনের কর্মকান্ড ঘটায়।

এরমধ্যে আমরা তিনমাস অতিক্রম করেছি। বড় ধরনের কোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেনি। যে সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বী আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের লাঠিয়াল ছিলেন– তাদের বাসাবাড়িতে সেই উত্তাল সময়ে যে আক্রমণ হয়েছে, সেটাকে সংখ্যালঘুর উপর হামলা বলে ধরা যায় না। আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোকেরাও এই জনরোষের বলি হয়েছেন। এর বাইরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, যেখানে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন,

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

যুদ্ধের উপর দাঁড়ানো আমেরিকার অর্থনীতি, ট্রাম্প বলছেন যুদ্ধ বন্ধ করবেন

"যুক্তরাষ্ট্র কখনো যুদ্ধকে সমর্থন করে না।" বিজয় ভাষণে বলেছেন আমেরিকার সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি বিশ্বে চলমান সব যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প এমন সময় ঘোষণাটি দিলেন, যখন তিন বছর ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। প্যালেস্টাইনে নতুন করে ইসরায়েলের ভয়াবহ রক্তাক্ত আগ্রাসন ও গণহত্যা চলছে গত এক বছর ধরে। ফিলিস্তিনিদের নিজ দেশ ও ভূমি থেকে সমূলে উচ্ছেদ ও নির্মূল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল এ জাতিগত নিধন চালাচ্ছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল সে হামলা আরো তীব্র করেছে। গত ১ বছর ১ মাসের আগ্রাসনে নিহত হয়েছে ৪৩ হাজার ফিলিস্তিনি।আহত হয়েছে লাখের বেশি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় বলছে, গত ছয় মাসে গাজায় যারা নিহত হয়েছে, তার ৭০ ভাগই নারী ও শিশু। সংস্থাটি বলছে, এদের ৮০ ভাগই আবাসিক বিল্ডিং বা একই ধরণের থাকার জায়গায় উপর হামলায় নিহত হয়েছে। যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে গাজার হাসপাতালে, জাতিসংঘ শরণার্থী শিবিরে মিসাইল ছুড়ছে ইসরায়েল। গাজায় যুদ্ধ নয়, চলছে নির্বিচারে, পরিকল্পিত গণহত্যা। চলছে বিশ্বের মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনকে মুছে দেয়ার চেষ্টা। সম্প্রতি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সমর্থক হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীকে নির্মূলের নামে লেবাননেও আগ্রাসন শুরু করেছে ইসরায়েল। বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়ে হত্যা করেছে প্রায় তিন হাজার লেবানিজকে। হামলা চালিয়েছে ইরান ও সিরিয়ায়। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইন, বিশ্ব জনমত কোন কিছুকেই ইসরায়েল তোয়াক্কা করছেনা।

ইসরায়েলকে অস্ত্র, অর্থ, সমর্থন দিয়ে সর্বতোভাবে মদত দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা। এই সেপ্টেম্বরে আমেরিকা ইসরায়েলের জন্য ৮.৭ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ অনুমোদন করেছে। এ নিয়ে গত একবছরে আমেরিকা ইসরায়েলকে ১৮ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েছে।

অন্যদিকে ২০২২ সাল থেকে চলা ইউক্রেন যুদ্ধ থামার কোন লক্ষণ নেই। এ যুদ্ধ শুরু হয় ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ হলেও, ইউক্রেনকে সামনে রেখে রাশিয়ার সাথে ছায়াযুদ্ধ করছে বাস্তবে আমেরিকা, যুদ্ধজোট ন্যাটোকে সাথে নিয়ে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু পর এ পর্যন্ত ইউক্রেনকে ৬১ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়েছে আমেরিকা।

অন্যদিকে তাইওয়ানকে ঘিরে চীনের বিরুদ্ধে নতুন করে এ অঞ্চলে যুদ্ধোম্মাদনা সৃষ্টি করেছে। নতুন করে তাইওয়ানের কাছে ৪৪০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করবে আমেরিকা। অর্থাৎ বিশ্বজুড়েই যুদ্ধ, যুদ্ধ উম্মাদনা সৃষ্টি ও চক্রান্তের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ আমেরিকা যুক্ত।

ফলে আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সব ধরণের যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ট্রাম্প কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করবেন, সেরকম কোন পরিকল্পনা হাজির করেননি। অনেকে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন, ট্রাম্প তার যুদ্ধ

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org